দৈনিক বাংলা
006077
তারিখ 13 MAY-1986

স্নেহ

শিক্ষক: কল্যকার ও অদ্যকার

ডক্টর মালিহা খাতুন

অন্তর প্রশান্তি হারিয়ে অতি উদ্বেগের শিকারে পরিণত হয়েছেন। আর তিনি সাধন বস্তুকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে বিভ্রান্তিকর বস্তু-নির্ভর জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

বলা বাহুল্য, 'কল্যকার শিক্ষক' বলতে আমি আগেকার দিনের শিক্ষক এবং 'অদ্যকার শিক্ষক' বলতে আজকের দিনের শিক্ষকদের কথা বোঝাতে চেয়েছি; তবে 'আগের দিন' নিয়ে আমি সুদূর অতীতযুগে যাইনি। আমি কেবল বৃটিশ আমলের সূচনালগ্ন থেকেই এ আলোচনার সূত্রপাত করেছি এবং আজ পর্যন্ত তার কিছুটা জের টেনেছি।

আমরা সকলেই জানি, বৃটিশরা এ দেশে প্রচলিত বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে এক অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল আর সে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তারা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার জন্য স্বদেশীয়দের দ্বারা এমন একটি 'শিক্ষিত শ্রেণী' সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, যারা তাদের প্রশাসনিক যন্ত্রটিকে দক্ষতার সঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্যপানে চালিয়ে নিতে পারবে। এ কথাটিকেই অধিকতর পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য আমরা বলে থাকি 'কেরানী সৃষ্টি' করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা এদেশে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। কোন উচ্চ আদর্শ, শিক্ষার স্ফুর্তি বা মনুষ্যোচিত জীবন-যাপনের জন্য পৌর্বাহিক প্রস্তুতি এ শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনই ছিল না: বৃটিশ প্রবর্তিত এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল অতিশয় সকীর্ণ এবং কেবল নিজেদের স্বার্থের প্রতি কেন্দ্রীভূত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেরানী সৃষ্টির জন্য তারা এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল, তা থেকে সৃষ্টি হতে লাগল জ্ঞান-মনীষায় ভাস্বর, প্রজ্ঞাসমুজ্জ্বল একেকজন বিরাট ব্যক্তিত্ব। ভাবতে অবাক লাগে, একটি দেশে একই সময়ে কেমন করে সাহিত্যে-শিল্পে, দর্শনে-রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে-ইতিহাসে, কৃষ্টিতে-গবেষণায়—এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একেকজন দিকপাল সৃষ্টি হলেন? সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-ইকবাল-শরৎচন্দ্র; শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ-জয়নুল আবেদীন-চুঘতাই; দর্শনে পরমহংস, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ; রাজনীতিতে গান্ধী-জিন্নাহ-নেহরু-ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দী-সুভাষ বসু; বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-মেঘনাথ সাহা-কুদরত-ই-খুদা, ইতিহাসে রাখাল দাস, রমেশ মজুমদার, যদুনাথ সরকার; গবেষণায় ডঃ সুনীতি কুমার, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি কালজয়ী প্রতিভার জন্ম হল। আর যাঁরা সাধারণ শিক্ষাটুকু মাত্র পেলেন, তাঁরাও আজকের যুগের উচ্চ শিক্ষিতদের চেয়ে জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যায়-প্রজ্ঞায় স্বমহিম স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠলেন—দেশের জন্য তাঁরাও বয়ে আনলেন কত দ্রব্য-সামগ্রী, রেখে গেলেন কত অতুলন অবদান!

শুধু কি তাই? এঁরা এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন যে যে বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হত না, সে-রাজত্ব থেকে সূর্যকে অস্তমিত করে তবে ছাড়লেন! ....

এদেশ থেকে বৃটিশ বিতাড়নের পর আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বহুবার ঢেলে সাজিয়েছি, বহু শিক্ষাকমিশন বসিয়েছি, শিক্ষাব্যবস্থায় বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছি। 'কেরানী সৃষ্টির' শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে আমরা 'মনীষী সৃষ্টির' শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মনীষী সৃষ্টি করতে গিয়ে ..আমরা উপযুক্ত যোগ্য কেরানীও সৃষ্টি করতে পারছিনে। এর কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে কল্যকার ও অদ্যকার শিক্ষকের তথা শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য।

প্রকৃত অর্থে শিক্ষকই হলেন সকল শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। তাই শিক্ষকের গুণাবলীতে বিভূষিত একজন প্রাণবান শিক্ষক একটি দেশ ও জাতিকে প্রাণস্ফূর্তিতে ও প্রাণ-সম্পদে ভরে তুলতে পারেন। আগের দিনের শিক্ষক এমনি একটি প্রাণ নিয়ে, এমনি শিক্ষকসুলভ গুণাবলী নিয়ে শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। শিক্ষকতাকে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে জীবনের মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং সে ব্রত উদযাপনের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকারে সদাপ্রস্তুত থাকতেন।

আগেকার দিনের শিক্ষকরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষকের জীবন মূলতঃ উৎসর্গীকৃত জীবন। তাই ভোগ-সর্বস্ব জীবনের প্রতি তারা কখনও বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হতেন না; বিভ্রান্তিকর, আসক্তিপূর্ণ ও বস্তু-নির্ভর জীবন থেকে দূরে সরে এসে তারা একান্তে, আপনমনে, বিদ্যালয়ের অঙ্গনটিকে জীবনের বড় আশ্রয় ও পরম আশ্রম বলে গ্রহণ করতেন। এই আশ্রমবাসী শিক্ষকের জীবনের মৌল লক্ষ্য ছিল 'টু লার্ন এ্যান্ড নট টু আর্ন' .... একটি কোমল, নমনীয় ও অগঠিত শিশু-কোরককে বিকশিত করে তাকে সুরভিত মানব-পুষ্পে পরিণত করার আনন্দের চেয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া আর কি হতে পারে? এই 'পরম পাওয়া' পেয়েই তাঁরা চরম তুষ্ট ছিলেন। তাই পার্থিব বিপন্ন-বিষাদ, নৈরাশ্য-নির্বেদ তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারত না—একটা সমতা-সংযম, সদা প্রফুল্ল ও প্রসন্ন-প্রশান্তিময় উদার মন নিয়ে তাঁরা সর্বদা শিক্ষার্থীদের কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। করুণাময়-স্নেহে, শাসনে-সোহাগে, প্রীতিতে ভালবাসায় তারা শিক্ষার্থীদের আপন সন্তানতুল্য মনে করতেন। পান্ডিত্যের গৌরব, পদমর্যাদা বা কৌলিন্যের অহংকার কখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে দূর-ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া করতে পারত না।

তখনকার দিনের শিক্ষকরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, যখন অন্তরঙ্গ আনন্দময়তার ভিতর দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়—এই 'ত্রয়ীর' মধ্যে একটি আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তখনই শিক্ষাদান কার্য সার্থক হয়ে ওঠে। তাই তারা এই 'আত্মিক যোগাযোগ' স্থাপনের ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন; ফলে একদিকে যেমন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটি ছিল নিবিড়, মধুর, প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহের বারি-নিষেকে তা অভিসিঞ্চিত ও ভক্তির নিষ্যন্দিত-নির্যাসে সুরভিত—তেমনি অপর দিকে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সম্ভাবনা অঙ্কুরে-কিশলয়ে, শাখায়-পল্লবে, সবুজে-শ্যামলে, সজীবতায়-প্রাণময়তায় দলের পর দল মেলে প্রকাশিত-বিকাশিত হয়ে উঠতো। এই ভাবে একটি কোরক-বদ্ধ শিশু শিক্ষকের আন্তরিকতায়, আরাধনায়, পরিচর্যায় ও পরিচালনায় বিকশিত হয়ে 'হৃদ পদ্ম সম্ভব' হয়ে উঠতো—যার সৌরভে এবং গৌরবে দশদিশ আমোদিত হত।

শিক্ষকের প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিত হয়ে এই ভাবেই তা সৃষ্টিতে হয়েছিল কেরানীর স্থলে দেশের এতসব মূল্যবান প্রাণ-সম্পদ—দার্শনিক-রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক, শিল্পী-মনীষী, এবং বৃটিশ-সিংহকে পরাভূত করার মত একটি শক্তিশালী জাতি! আর এ জাতির স্থপতি এবং রূপকার ছিলেন সে যুগের নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক: আত্মিক ঐশ্বর্যবান, আনন্দময় মানসিক বৈভবে মূর্তিমান, দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর গুণে গুণবান। এই সকল শিক্ষকের কাছে চলার পথের সকল বাধাই ছিল তুচ্ছ। তাই শিক্ষাব্যবস্থা, প্রতিকূল পরিবেশ, রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতা কোনটাই তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ দুর্বার ইচ্ছাশক্তির কাছে বাধার বিন্ধ্যাচল কখনও পথরোধ করে দাঁড়াতে

মহিলা মহল

পারে না।

কিন্তু আজ যখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, দেশের আদর্শ, দর্শন, লক্ষ্য ও চাহিদার সঙ্গে সুসম্পর্কিত ও সুসম্পৃক্ত করে শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করার সুপ্রচুর সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সংখ্যাও বেড়েছে; এমন কি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাও আজ নেহাৎ সীমিত নয়; স্কুলের টিনের ছাওনি ও তরজার বেড়ার স্থলে অনেক জায়গায় সুদৃশ্য ইমারতও উঠেছে; শিক্ষোপকরণ, সরকারী সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে; আগেকার দিনের দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত আধি-ব্যাধি-জর্জরিত শিক্ষকের তুলনায় এখনকার দিনের শিক্ষকদের অবস্থার কিছুটা উন্নতিও ঘটেছে, তখন কেন শিক্ষার এই শ্রীহীন দৈন্যদশা?

এখনকার দিনের শিক্ষকের প্রাপ্ত সরকারী-বেসরকারী সুযোগ সুবিধাগুলি আগেকার দিনের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধের সঙ্গে তুলনা করলে তা আকারে-হারে অনেক বেশি হবে না কি?

সর্বোপরি, আমাদের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য তো অনেক উচ্চে সংস্থাপিত; কেরানী সৃষ্টি নয়—মনীষী সৃষ্টি, কাজের মানুষ সৃষ্টি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য—যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের স্বাধীন দেশের নতুন মানবগোষ্ঠী হবে স্বাধীন দেশের সুযোগ্য নাগরিক, নানা সুলভ গুণে বিভূষিত গৌরান্বিত মানুষ। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটি দেখা কেন?

এর কারণ হিসেবে এক কথায় বলা যায়, মানুষ গড়ার কারিগরের মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেছে—আগেকার দিনের শিক্ষক ও এখনকার দিনের শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে দুঃখজনক বৈপরীত্য। দ্বিতীয়তঃ অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে হয়, আমাদের শিক্ষার বিস্তীর্ণ অঙ্গন জুড়ে রয়েছে এখন জীবনের সর্ব ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় পরাজিত নিষ্ফল শরণার্থীদের দল। শিক্ষকতাকে এঁরা কেউ জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেননি, অনন্যোপায় হয়ে নিছক জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে এ পেশাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বস্তুবাদী, আরাম-আয়েশভোগী উচ্চাভিলাসী ব্যক্তির জন্য এ পেশা নয়—যারা প্লেইন লিভিং এ্যান্ড হাই থিংকিং-এ বিশ্বাসী আমাদের দেশ বর্তমান মুহূর্তে তার সীমিত সম্পদ নিয়ে কেবল তাদেরই শিক্ষার কৃচ্ছতার অঙ্গনে স্থান দান করতে পারে—অতি উচ্চ-অভিলাসীদের এখনও এখানে স্থানাভাব। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার মধ্যে যে এক মহান আদর্শ ও উচ্চ চিন্তার আভিজাত্য আছে, আগেকার দিনের শিক্ষকরা তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তাই তারা ছিলেন জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার অনেক উর্ধ্বে।

কিন্তু বর্তমান যুগের শিক্ষক বস্তু-নির্ভরতা ও ভোগ-সর্বস্বতার দিকে দ্রুত প্রধাবিত হচ্ছেন; ফলে অন্তর-প্রশান্তি হারিয়ে অতি-উদ্বেগের শিকারে পরিণত হয়েছেন তিনি—আর তাঁর সাধন-বস্তুকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে তিনি বিভ্রান্তিকর বস্তু-নির্ভর জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন; আসক্তি ও অতৃপ্তি জনিত চিত্ত-বিক্ষুব্ধির দ্বারা জীবন-যাত্রাকে দুর্ভর, দুর্মর ও দুর্বিসহ করে তুলেছেন—ফলে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই, সন্তুষ্টি নেই, তৃপ্তি নেই। শিক্ষকের জন্য যে গুণাবলী অপরিহার্য—তাঁর যে ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ভাব-ভাবনা, দূর-চিন্তন, পূর্ব-প্রস্তুতি, পূর্ব-পরিকল্পনার দরকার, তাঁর সব কিছুকেই আজকের শিক্ষক হারিয়ে বসেছেন। ফলে শিক্ষক প্রকৃত অর্থে তাঁর শিক্ষকত্বকে, তাঁর অস্তিত্বকে হারিয়ে বসেছেন। ছাত্রদের জন্য স্বকীয় শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন, তাদের জন্য ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার অবসর যে শিক্ষকের নেই, সে শিক্ষক কোনদিন সার্থক শিক্ষক হতে পারেন না। তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছে পঠন-অনীহা, নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য।

আর যারা 'শরনার্থী' হয়ে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা এ অবস্থাকে আরও প্রকট করে তুলেছেন। কিন্তু তাঁরাই বা চিরকাল শরণার্থী হয়ে থাকবেন কেন? চেষ্টা, সাধনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে তারাও সুশিক্ষক হতে পারেন, এমন কি জাতশিক্ষককে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারেন। শেকসপীয়র-এর একটি মূল্যবান উক্তি এখানে স্মর্তব্য: তিনি বলেছেন—'সাম আর বর্ণ গ্রেট, সাম এ্যাচিভ গ্রেটনেস, সাম হ্যাভ গ্রেটনেস থ্রাস্ট আপন দেম।' দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টালে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-কোন ব্যক্তি স্মরণীয় অবদান রাখতে পারেন। কারণ, প্রতিভা একভাগ মাত্র; বাকী নিরানব্বই ভাগই হল প্রচেষ্টা। আন্তরিক প্রয়াস-প্রযত্ন, নৈষ্ঠিক কর্মতৎপরতা ও একাগ্রতা থাকলে যে-কোন ব্যাপারেই সফলতা অর্জন করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের আজকের শিক্ষকদের মধ্যে এই জিনিসটিরই 'দুর্ভিক্ষ' দেখা দিয়েছে। তারই ফলে আজ শিক্ষার এমন শ্রীহীন দৈন্যদশা।

আগেকার দিনের শিক্ষকদের মত এখনকার দিনের শিক্ষকগণ

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

স্নেহ-প্রীতি, ও শাসন সোহাগের সাহায্যকরণে শিক্ষার্থীদের লালন ভূমি 'মনের' মধ্যে আসন পাতায় চেষ্টা করেন না; তাদের মন জেনে মনের মর্মমূলে নাড়া দেওয়া বা দোলা দেওয়ার চেষ্টা করেন না: ফলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে—তারা পরস্পর পরস্পরকে কেবল দূরে থেকে অবলোকন করছে: কারণ তাদেরকে নিকট-সামীপ্যে আনার জিনিসগুলিকে তারা তুচ্ছজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করেছেন।

তাই ছাত্রদের পঠন-অনীহা নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যকে শিক্ষকগণ কেবল চিত্রার্পিতের মতো অবলোকন করেন, [illegible] বা দুঃখিতও হন কিন্তু এর প্রতিবিধানের উপর উদ্ভাবনের চেষ্টা তাদের কোথায়? আগেকার দিনের শিক্ষকরা কি পেরেছেন এই ভূমিকা পালন করতে? এখানেই কল্যকার শিক্ষক ও অদ্যকার শিক্ষকের মধ্যে মৌল পার্থক্য। শিক্ষার্থীর জন্য নিবেদিত প্রাণ। শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর [illegible] বড়ো কাম্যবস্তু আর কি [illegible]? শিশু দেবতার [illegible] দেবতা আর কে আছে? অধুনা শিক্ষকগণ এই সহজ-সরল সত্যটিকেই অবলীলাক্রমে ভুলে বসে আছেন। কিন্তু কল্যকার শিক্ষকের কাছে এটাই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়।